وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ

ওয়াকিয়ায়ে কারবালা
বা
কারবালার মর্মান্তিক
কাহিনী

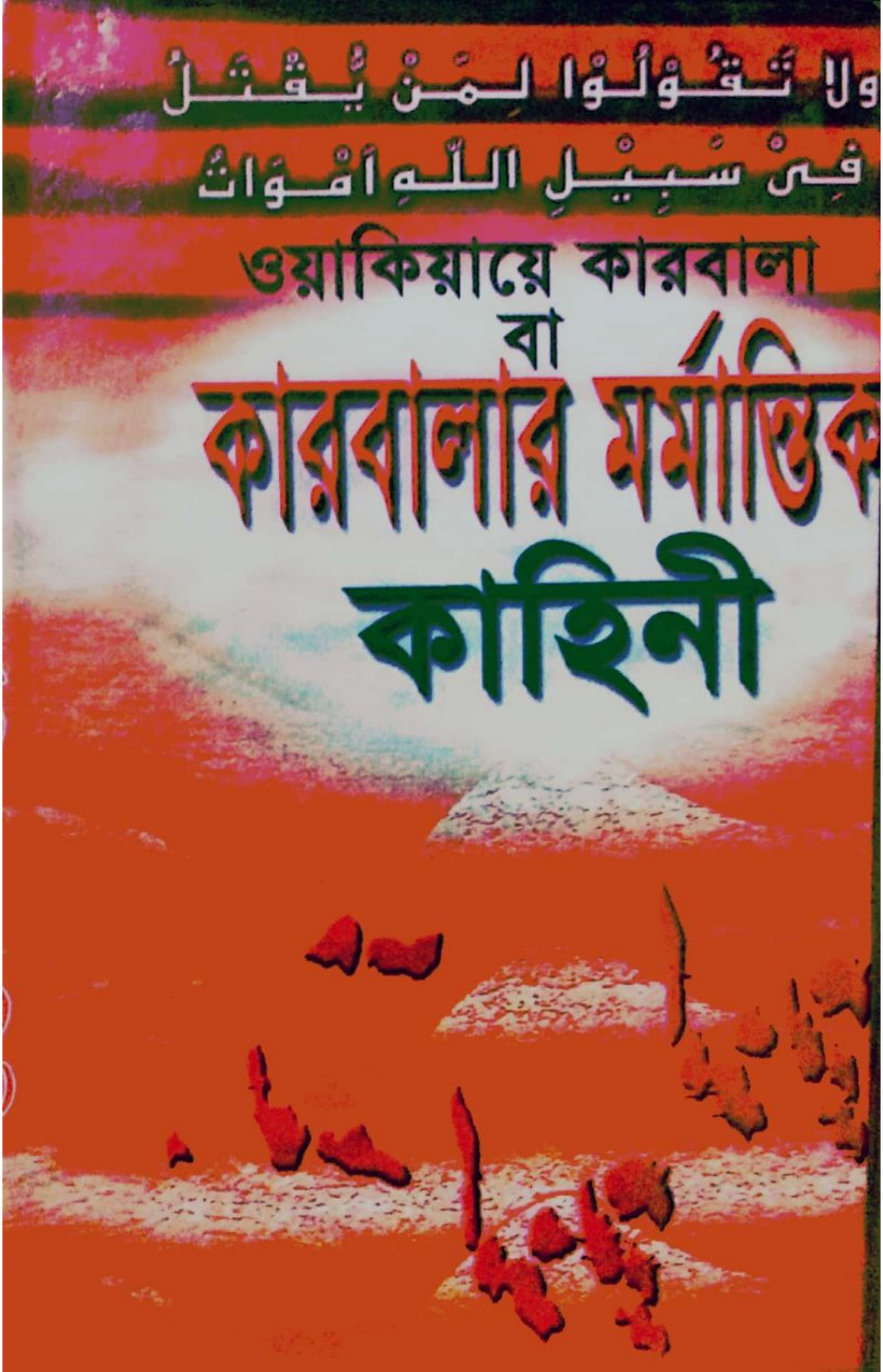

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুয়াবিয়া (রা) এর শাসনকাল–পরিবর্তনের ধারা	৫
রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পরিবর্তন	৬
হত্যা ও পরনিন্দা	৬
প্রাদেশিক শাসন কর্তাদেরকে অসীম ক্ষমতা প্রদান	৯
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা	১১
পূর্ববর্তী শাসকদের পথ হতে বিচ্যুত শাসক গোষ্ঠী	১২
উত্তরাধিকারী নীতিতে পরিবর্তন	১৪
গভর্নরদেরকে আইনের উর্ধ্বে স্থান দান	১৬
কারবালার পথে মৃত্যু আলিঙ্গনে	১৮
সবার অনুরোধ বিফলে গেল	২০
ইয়াজিদের বাহিনী প্রধানের সাথে কথোপকথন	২১
আপনার ইমামতিতেই নামাজ আদায় করবো	২১
আমি আজ মহাসংকটে নিপতিত	২২
হযরত ইমাম হোছাইন (রা) এর বক্তৃতা	২৩
এটা কোন সামরিক অভিযান ছিল না	২৪
আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন	২৭
পত্র প্রেরণ	২৭
নিষ্ঠুর কারবালায় ইমাম হোছাইন (রা) এর অবস্থান	২৮
দুত প্রেরণ	২৯
পিপাসা নিবারণে পানি তারা দিল না	২৯
শিমার ইবনে যিল জোশান	৩১
ইয়াজিদীয় বাহিনীর আক্রমণের প্রস্তুতি	৩১
হযরত আব্বাস ইবনে আলীর চেষ্টা	৩২
হে যমানা; আক্ষেপ তোর জন্য!	২৩
জীবনের শেষ রাত	৩৪
ইমামের ভাষণ দান	৩৫
আমার কি অপরাধ ?	৩৬
ইয়জিদীয় বাহিনীর স্বপক্ষে ত্যাগ	৩৭
প্রথম আক্রমণ	৩৯
ইয়াজিদ বাহিনী কর্তৃক অগ্নিসংযোগ	৪০
আল্লাহকে সেজদা করতেও দেবে না।	৪০
বীর পুত্রের শাহাদাত বরণ	৪২
রুধির ধারায় রঞ্জিত সদ্য ফোটা জান্নাতী ফুল	৪৩
হোছাইনের রক্তে লাল ময়দান কারবালা	৪৪
বাচ্চাকে যুদ্ধের ময়দানে আসতে দিওনা	৪৫
হাতের অস্ত্র ইমামের বিপক্ষে	৪৬
ইমামের পবিত্র মাথার অবমাননা	৫০
ঐ ঠোঁটে বিশ্ব নবী (স) চুমো দিচ্ছেন	৫০
ইমাম পরিবারের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ	৫২
প্রতিবাদকারীর মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হলো	৫৪
ইয়াজিদের বক্তব্য	৫৬
পবিত্র মদীনা আক্রমণ	৫৭
বায়তুল্লাহ শরীফের ধ্বংস সাধন	৫৮
বিশ্বনবী (স) এর ভবিষ্যৎ বাণী ও ফলাফল	৫৯
ইয়াজীদের সিংহাসন দখল	৬১
ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাত	৬১
হত্যাকারীদের নিকৃষ্ট পরিণতি	৬৩

মুয়াবিয়া (রা) এর শাসনকাল–পরিবর্তনের ধারা

হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর শাসনামলে থেকে রাষ্ট্র শাসনের ব্যাপারে নানা ধরনের পরিবর্তন শুরু হয়। পরিবর্তনের এধারা ক্রমশঃ পরবর্তীতে বৃদ্ধিই পেতে থাকে। অবশেষে তুরস্কের মোস্তফা কামালের হাত দিয়ে খেলাফত শব্দটাই রাষ্ট্রের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর সময় থেকে পরিবর্তনের এমন ধারা শুরু হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাসের একটি পর্যায়ে ধারণা সৃষ্টি হলো, ইসলাম এসেছে শুধু ধর্ম হিসেবে, রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

অর্থাৎ ধর্ম আর রাজনীতি পৃথক জিনিস। এই ধারণা সে সময়ের সেই পরিবর্তনের ধারার সাথেই সম্পৃক্ত। বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ঐ ধারণা মুসলমানদের মন-মগজে যেন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

সে সময়ে প্রথম যে পরিবর্তন শুরু হয়, তা হলো জনগণের রায়ে খলিফা নির্বাচনের ধারায় আমূল পরিবর্তন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চপদে আসীন হবার ব্যাপারে বংশধারাকে প্রাধান্য দেয়া শুরু হলো। এভাবে যে পরিবর্তনের সূচনা করা হলো, ইয়াজিদকে ক্ষমতায় বসিয়ে সে ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে রাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে দেয়া হলো।

তখন থেকেই শাসকদের প্রতি জনগণের বাধ্যতামূলক আনুগত্য লাভ ও বংশধরদের উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হওয়ার এক অযৌক্তিক ধারা শুরু হয়। মুসলিম রাষ্ট্রের জনগণ কোন শাসকের আনুগত্য করবে অথবা করবেনা, সে স্বাধীনতা তারা পায়নি।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকগণ যদিও নিজেদের নামের পূর্বে 'খলীফা' শব্দ জুড়ে দিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল বাদশাহ। সাধারণ জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা বসবাস করতেন বাদশাহী মহলে। এ সম্পর্কে আল্লামা মওদুদী (রাহ) বলেন, "রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী তাদের রাজপ্রাসাদের হেফাযতে নিয়োজিত হয় এবং সর্বদা তাদের পাহারায় নিযুক্ত থাকে। তাদের এবং জনগণের মধ্যে দেহরক্ষী ও প্রহরী অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সরাসরি তাদের কাছে প্রজাদের পৌঁছে এবং প্রজাদের মধ্যে তাদের নিজেদের বসবাস ও চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য তারা অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। কর্মাচারীদের মাধ্যমে কোন সরকার কখনো সঠিক অবস্থা জানতে পারে না। আর মাধ্যম ছাড়া সরাসরি নিজেদের প্রয়োজন এবং অভিযোগ পেশ করা প্রজাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। খোলাফায়ে রাশেদীন যে ধারায় শাসন কার্য পরিচালনা করতেন, এটা ছিল তার সম্পুর্ণ বিপরীত-একেবারেই তার পরিপন্থী। তাঁরা জনগণের মধ্যে বাস করতেন। সেখানে যে কোন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতো। তাঁরা হাট-বাজারে গমন করতেন এবং যে কোন ব্যক্তি তাঁদের সাথে কথা বলতে পারতো। তাঁরা জনগণের সাথে সারিবদ্ধ হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন এবং জুমার খোতবায় (অভিভাষণে) আল্লার যিকর এবং দ্বীনের শিক্ষার পাশাপাশি সরকারের নীতি সম্পর্কেও জনগণকে অবহিত করতেন। তাঁদের নিজেদের এবং সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের যে কোন অভিযোগের জবাব দিতেন তাঁরা। হযরত আলী (রা) প্রাণের আশংকা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত কুফায় এ

নিয়ম বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের সূচনা পর্ব থেকেই এ পন্থা ত্যাগ করে রোম-ইরানের মডেল গ্রহণ করা হয়। এ পরিবর্তনের সূচনা হয় হযরত মুআবিয়া (রা)-এর শাসনকাল থেকেই। পরে এ ধারা রীতিমতো এগিয়ে চলতে থাকে।

রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পরিবর্তন

রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা বায়তুল মালে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। রাষ্ট্রের অর্থ সম্পদের ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা হলো, "রাষ্ট্রের অর্থ সম্পদ খলীফা এবং তার সরকারের নিকট আল্লাহ ও দেশের জনগণের আমানত।" এ অর্থ সম্পদ কেউ ইচ্ছে অনুযায়ী ব্যয় করতে পারবে না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী যেমন এ অর্থ সম্পদ জমা হবে তেমনি ব্যয় হবে।

কিন্তু খেলাফত ব্যবস্থার অবসান রাষ্ট্রের অর্থ সম্পদ শাসকের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছিল। দেশের জনগণ হয়ে পড়েছিল শাসকের নিকট শুধুমাত্র করদানকারী। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ সম্পদ আমদানির ব্যাপারে যেমন বৈধ অবৈধ পথের বিচপর বিবেচনা করা হতো না, তেমনি তা ব্যায়ের ব্যাপারেও হালাল হারামের তোয়াক্কা করা হতো না। এসব ব্যাপারে জনগণের কোন প্রশ্ন করারও অধিকার ছিল না।

খেলাফত ব্যবস্থার অবসানের পরে দেশের জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। রাজতন্ত্রের আমলে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহ) এর আলোচনায়, "মুসলমানদের আম্‌র বিল মারুফ ও নাহ্‌ই আনিল মুনকার–ভাল কাজের নির্দেশ দান এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ-করার স্বাধীনতা হরণ। অথচ ইসলাম এটাকে কেবল মুসলমানদের অধিকারই নয়, বরং ফরয বা কর্তব্য বলে স্থির করে দিয়েছিল। জাতির সচেতন বিবেক জনগণের বাক-স্বাধীনতা, যে কোন অন্যায় কাজে সর্বোচ্চ আসনে সমাচীন ব্যক্তির সমালোচনা এবং প্রকাশ্যে সত্য কথা বলার স্বাধীনতার ওপরই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া নির্ভরশীল ছিল। খেলাফতে রাশেদার আমলে জনগণের এ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ সংরক্ষিত ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীন এ জন্য শুধু অনুমতিই দিতেন না, বরং এজন্য জনগণকে উৎসাহিতও করতেন। তাঁদের শাসনামলে সত্যভাষীর কণ্ঠরোধ করা হতো না; বরং এ জন্য তাঁরা প্রশংসা এবং অভিনন্দন লাভ করতেন। সমালোচকদের দাবিয়ে রাখা হতো না, তাদেরকে যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু রাজতন্ত্রের যুগে বিবেকের ওপর তালা লাগান হয়, মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রশংসার জন্য মুখ খোল অন্যথায় চুপ থাকো–এটাই রীতিতে পরিণত হয়। যদি তোমার বিবেক এতই শক্তিশালী হয় যে, সত্য ভাষণ থেকে তুমি নিবৃত্ত থাকতে না পারো তাহলে কারাবরণ, প্রাণদণ্ড ও চাবুকের আঘাতের জন্য প্রস্তুত হও। তাই সে সময়ে যারা সত্য ভাষণ এবং অন্যায় কাজে বাধা দান থেকে নিবৃত্ত হননি, তাদেরকে কঠোরতম শাস্তি দেয়া হয়েছে। সমগ্র জাতিকে আতংকিত করাই ছিল এর লক্ষ্য।

হত্যা ও পরনিন্দা

হযরত মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী একজন সাধক ও ইবাদাতগুযার, এবং উম্মাতের সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হযরত হুজুর ইবনে আ'দীর হত্যার (৫১ হিজরী) মাধ্যমে এ নতুন পলিসীর সূচনা হয়। হযরত মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলে খোতবায় প্রকাশ্য মিম্বারে হযরত আলী (রা)-এর ওপর

লানত (অভিসম্পাত) এবং গালিগালাযের সিলসিলা শুরু হলে সকল সাধারণ মুসলমানের হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অতি কষ্টে সবরের পেয়ালা পান করে তাঁরা চুপ করে থাকতেন। কুফায় হুজুর ইবনে আ'দী তা সহ্য করতে পারেননি। তিনি হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসা এবং হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিন্দা শুরু করেন। হযরত মুগীরা (রা) যতদিন কুফার গভর্নর ছিলেন, ততদিন তিনি ব্যাপারটি এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু পরে বসবার সাথে কুফাকেও যিয়াদের গভর্নরীর অন্তর্ভুক্ত করা হলে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যিয়াদ খোতবায় হযরত আলী (রা)-কে গালি দিতেন, আর হুজুর (রা) দাঁড়িয়ে তার জবাব দিতেন। এ সময় তিনি একবার জুমার সালাতে বিলম্বের জন্যও যিয়াদের সমালোচনা করেন। অবশেষে যিয়াদ ১২ জন সঙ্গীসহ তাঁকে গ্রেফতার করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্তাপন করেনঃ তিনি একটি গুপ্তবাহিনী গঠন করেছেন, খলীফাকে প্রকাশ্যে গালী দেন, আমিরুল মুমীনীনের বিরুদ্ধে লড়াই-এর আহবান জানাচ্ছেন এবং আলী (রা)-এর বংশধর ব্যতীত অন্য কারো জন্য খেলাফত জায়েয নয় বলে দাবি করেছেন। তিনি শহরে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছেন এবং আমিরুল মুমিনীনের গভর্নরকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আবু তোরাব [হযরত আলী (রা)]-কে সমর্থন করেন, তাঁর জন্য রহমত কামনা করেন এবং তাঁর বিরোধীদের থেকে দূরে থাকেন।" এ অভিযোগের স্বপক্ষে কতিপয় ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহন করা হয়।" কাযী শুরাইহ্‌কেও অন্যতম সাক্ষী হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু তিনি এক পৃথক পত্রে হযরত মুআবিয়া (রা)-কে লিখে পাঠানঃ "আমি শুনতে পেলাম, আপনার নিকট হুজুর ইবনে আদীর বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছে, আমার নামও তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে আমার সত্যিকার সাক্ষ্য এই যে, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, নিয়মিত হজ্জ ও ওমরাহ করে, ভাল কাজের নির্দেশ দান করে, অন্যায় কার্য থেকে বারণ করে, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রক্ত সম্পদ সম্মান–হারাম। আপনি ইচ্ছা করলে তাঁকে হত্যা করতে পারেন অথবা ক্ষমা করে দিতে পারেন।"

এমনিভাবে এ অভিযুক্তকে হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। হত্যার পূর্বে জল্লাদরা তাঁর সামনে যে কথাটি পেশ করে তা হচ্ছে, তুমি আলীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করলে তোমাকে মুক্তি দান, অন্যথায় হত্যা করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি তা করতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন–"আমি মুখে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারি না, যা আমার রবকে অসন্তুষ্ট করে।" অবশেষে ৭জন সঙ্গী সহ তাঁকে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে হাস্‌সানকে হযরত মুআবিয়া (রা) যিয়াদের নিকট ফেরত পাঠান। তিনি যিয়াদকে লিখেন, একে নৃশংসভাবে হত্যা করো। যিয়াদ তাঁকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেন।"

এ ঘটনা উম্মাতের সকল সাধু সজ্জনের হৃদয়ে দেয়। হযরত আব্দুল্লা ইবনে ওমর এবং আয়েশা (রা) এ খবর শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হন। হযরত আয়েশা (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-কে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আগেই চিঠি লিখেছেন। পরে হযরত মুআবিয়া (রা) একবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি বলেনঃ "মুআবিয়া! হুজুরকে হত্যা করতে গিয়ে তুমি আল্লাকে এতটুকুও ভয় করলে না?" হযরত মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষ থেকে খোরাসানে নিযুক্ত গভর্নর রবী ইবনে যিয়াদ আল-হারেসী এ খবর শুনে চিৎকার করে ওঠেনঃ 'হ আল্লাহ! তোমার জ্ঞানঅনুযায়ী আমার মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ সৎকর্মশীলতাও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আমাকে